চর্যাপদ : সাহিত্যমূল্য

দেবায়ন চৌধুরী

কবিতা একধরনের আশ্রয়। কবির তো বটেই পাঠকেরও। আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি, যে জীবনে চাওয়া পাওয়ারা হাত ধরাধরি করে চলে না। আমাদের স্বপ্ন, আমাদের বাস্তব, আমাদের প্রত্যাশা, আমাদের প্রাপ্তির মধ্যে ব্যবধান যখন ছুঁয়ে ফেলে আলোকবর্ষ দূরত্ব, তখন অভিমানের পাহাড় জমে ওঠে। অভিমান অবশ্যই জীবনের পরে। এই মাটি পৃথিবীর 'পরে। যে সমাজে আমরা বাস করি, তাকে আপন বলে মনে হয় না। অস্তিত্বের এই চরম সংকটে, মনখারাপের মেঘকে বৃষ্টি হয়ে ঝরতে যে সাহায্য করে, সেই শিল্প। লেখকসত্তার বাসভূমি যদি হয় সমাজের সাথে অনাত্মীয়তার বোধ, তবে সেই একই বোধে আক্রান্ত পাঠকও খুঁজে নেয় লেখককে। শিল্পকে। কিংবা আশ্রয়কে। চর্যাপদ সেই ধরনের আশ্রয়। বাসনার জ্বরে জর্জরিত মানুষের চিত্তকে শীতল করতে চেয়ে যে শোনায় উপশমের স্বর—"নির্বিঘ্ন শূন্যের এই চরাচর, সেই দিকে/লক্ষ্য থাক, অন্যসব তুচ্ছ আর ফিকে।"[১] ঠিক করে দিতে চায় ভাবনার অভিমুখও—"আছে আর নেই মিলে গেছে একধারে,/বলো কোনজন এভাবে বুঝতে পারে?"[২] সব কিছুর মূলেই হয়তো কাজ করেছে জীবনের সাথে একধরনের বোঝাপড়ার তাগিদ। অবশ্যই তা শিল্পের বোঝাপড়া। চর্যাপদের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তাকেই 'কবিতার বোঝাপড়া।'

চর্যাপদ আমাদের প্রথম কবিতারই। বাংলা ভাষায় লেখা কবিতার প্রথম সংকলনও বটে। শুধু বাংলা ভাষার দিক থেকে নয়, বাংল সাহিত্যের দিক থেকেও এ কথা সত্য। চর্যাপদ সাহিত্য হিসেবে যখন সর্বজনস্বীকৃত। তখন এর 'সাহিত্যমূল্য' বিচার করার চাইতে এর সাহিত্যিকতার সেসব বৈশিষ্ট্যগুলোকে অনুধাবন করাই বেশি যুক্তিযুক্ত যার জন্য চর্যাপদ সাহিত্য হয়ে উঠেছে। কেননা—Art is a way of experiencing the artfulness of an object ; the object is not important."[৩]

চর্যাপদকে কবিতা হিসেবে দেখতে চাওয়ার আগে একটি বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া ভালো যে এগুলি আসলে গান। প্রতিটি পদের শীর্ষে গেয় রাগের নির্দেশ রয়েছে। চিহ্নিত করা আছে ধ্রুবপদও। গানের কথাকে আদৌ কবিতা বলা যায় কিনা সে প্রসঙ্গে এবার আসা যেতে পারে—"একদিক থেকে ভাবলে দেখা যায় আমাদের বাংলা সাহিত্য আসলে গীতিসাহিত্য। কেননা চর্যাগীতি, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মহাজন পদাবলি, শাক্তগীতি, বাউল গান, মারফতি গান, মাইজভাণ্ডারি, টপ্পা, কবিগান এসব পেরিয়ে তবে উনিশ শতকে এসে প্রথম লেখা হয়েছে কবিতা। অথচ বাংলা সাহিত্যের পঠনপাঠনে একেবারে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত আমরা বাংলা গানেরই নানা ধরণকে সাহিত্য বলে পড়ি এবং পড়াই। গানের ইতিহাস আমাদের সাহিত্যের

ইতিহাসে ঢুকে পড়েছে। সেটা ভাল হয়েছে না মন্দ হয়েছে যে সম্পর্কে মন্তব্য না করে বলা যায়, গানকে কবিতারূপে পড়া বা পড়ানো মারাত্মক ঝুঁকির ব্যাপার। কারণ কবিতা বিচারের মাপকাঠি, যেমন ভাব ছন্দ অলংকার চরণবিন্যাস, গানে প্রয়োগ করলে বিপদ বাধবে। কারণ ছন্দে হয়তো ত্রুটি ধরা পড়ল কিন্তু গানে সে ত্রুটি ঢেকে যাবে তানে বা মীড়ে। তাছাড়া গানের সত্যিকারের মর্ম লুকানো থাকে ঘুর, লয় ও তালে। সেগুলি বাদ দিয়ে গানকে কবিতার মতো আবৃত্তি করে পড়লে তার রস কিছুই ফোটে না। কবিতা নিজে পড়া যায়, গানের রূপায়ণে গায়ক লাগে। সেটা হল, যাকে বলে পারফর্মিং আর্ট। তাছাড়া, প্রকৃতপক্ষে গান আর কবিতা রচনার লক্ষ্য একেবারে আলাদা।"[৪] এবারে আমরা আবার উদ্ধৃত করবো আরো একজন বিদগ্ধ সমালোচকের মন্তব্য—

... সুরলক্ষ্যে রচিত পদকে কবিতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে এরকম গোজামিলে ত্রুটির ফাঁক পূরণ করতেই হয়। চর্যাগীতি মাত্রার হিসেবে কিংবা অক্ষরের হিসেবে ত্রুটিবহুল, আবেগমুক্ত চিত্তে এ তথ্য স্বীকার করাই ভাল। তা ছাড়া কথাগুলো যখন গীত হবার জন্যই বাঁধা—আমরা জানি, তখন গায়ের জোরে কবিতা বানাবার বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করাই শোভন এবং শ্রেয়ও। কারণ তাতেই পাঠককুল বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা বিভ্রান্তি থেকে নিস্তার পাবে। অবশ্য আমরা জানি—সঙ্গীতরূপেই সাহিত্যশিল্পের শুরু এবং ভারতের বৈদিক রচনা থেকে সব ভাষার সব রচনার মতো বাঙলা কাব্যমাত্রই চিরকালই রাগতাল যোগে গেয় ছিল। কিন্তু সেগুলো মূলত প্রচলিত ছন্দে পাঠযোগ্য করেই রচিত। কিন্তু এগুলো রচিত গেয় করেই।"[৫] আমরা আমদের আলোচনায় চর্যাপদকে কবিতা হিসেবে দেখতেই আগ্রহী, আমাদের পাঠ অভিজ্ঞতা অন্ততঃ সেরকমটাই বলে। গান ও কবিতা রচনার লক্ষ্য আলাদা হতে পারে, ভাবনাগত রূপায়ণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা থাকতে পরে, কিন্তু তার সাথে এটাও ঠিক পৃথক পৃথক শিল্পমাধ্যমের নিজস্ব শিল্পশর্ত বজায় রেখেও গান ও কবিতা বরাবর হাত ধরাধরি করে চলেছে। গানের কথা যেমন কবিতা হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে, তেমনি কোন কবিতা সুর সহযোগে গীত হয়েছে সহজেই। পৃথক পৃথক শিল্পমাধ্যমের পারস্পরিক সংযোগ ও সহযোগিতার কথা মাথায় রেখে চর্যাপদের একইসাথে গান ও কবিতা হয়ে ওঠার অনায়াস দক্ষতাকে কুর্নিশ জানিয়ে এ বিতর্কের ইতি টানছি।

"চর্যাগীতিকোষ শুধু বাংলার নয়, নতুন ভারতীয় আর্যভাষার প্রথম সংকলন।[৬] লুইপাদের পদ দিয়ে এই সংকলনের আরম্ভ। খুব সম্ভবত যেহেতু তিনি আদি সিদ্ধাচার্য ছিলেন, সে কারণেই ১নং এবং ২৯নং পদদুটিতে লুইপাদ সহজ সরল ভাষায় সহজ সাধন পদ্ধতির যোগতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন ; এই দুটি পদে বক্তব্য সম্পূর্ণ হয়েছে বলে হয়তো তাঁর আর কোন পদ সংযোজিত হয়নি। এর ফলে, পুনরুক্তিদোষ যেমন এড়ানো গেছে, ঠেকানো গেছে চর্যার সংখ্যাধিক্যও। সংখ্যার দিক থেকে চর্যাপদে সবচেয়ে বেশি পদ রয়েছে কাহ্নপাদের। মোট পদসংখ্যা ১৩টি। কাহ্নপাদ তাঁর বেশ কিছু রচনায় ডোম্বীকে সম্বোধন করে, তার সঙ্গে বিরহমিলনের যেসব চিত্র অঙ্কন করেছেন, তার মধ্য দিয়েও ব্যক্ত হয়েছে সাধনতত্ত্বই। ডোমনী কেবলমাত্র ডোমজাতীয়া রমনী নয়, সে পরিশুদ্ধাবধুতী নৈরাত্মা। তার সঙ্গে মিলনই কবির কাম্য। কাহ্নপাদের আরো কিছু পদ পাই আমরা যেখানে জ্ঞানোপদেশ প্রবল—সংকলক একই

কবির দু'ধরনের পদকে কৃতিত্বের সঙ্গে সাজিয়েছেন। কাহ্নপাদ ও ভুসুকু পাদের পদের সংখ্যাধিক্য থেকে অনুমান করাই যেতে পারে, এঁরা বেশ জনপ্রিয় ছিলেন। যেহেতু সহজ সাধনার ধারাটির নির্দিষ্ট পরিচয় দেওয়া সংকলনের কাম্য ছিল, তাই কোন একজনের পদ পরপর সন্নিবেশিত হয়নি। চর্যাকারদের আবির্ভাব কাল, অনুযায়ীও পদ সাজানো হয়নি, হয়েছে সাধনার ক্রমপর্যায়কে মনে রেখে, আর তাই ভুসুকু-র আটটি পদ (৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯) ঠাঁই পেয়েছে গোটা সংকলন জুড়েই। চর্যাপদের প্রথম দিকে সাধন পদ্ধতির বেশি আলোচনা থাকলেও শেষের দিকের পদে সাধকচিত্তের সিদ্ধিলাভের আনন্দই বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। একজন কবি সারাজীবন ধরে একটিই কবিতা লিখে যান—এরকম ধারণা প্রচলিত আছে। চর্যাপদের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি একাধিক কবি মিলে আসলে হয়তো একটিই কবিতা লিখতে চেয়েছেন। সেইসাথে এটাও বলার, চর্যাপদে যে সমস্ত কবিদের পদ সংকলিত হয়নি, তারা ও তাদের অদৃশ্য উপস্থিতি নিয়ে আছেন এই সুসংকলনে। কোনো সংকলন সামগ্রিক দিক দিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে তখনই, যখন সে, বহন করে পৃথক পৃথক কবির নিজস্ব উপস্থিতিকে। অর্থাৎ কবির আত্মপরিচয়ের সংকট নয়, বরং এক সামগ্রিক পরিচয়দানের সূত্রে ব্যক্তিত্বচিহ্নায়নের মধ্যেই থাকে সংকলনের সাফল্য। চর্যাপদ সেদিক থেকেও সসম্মানে উত্তীর্ণ। আজ যখন চারদিকে হাজার সংকলনের ভিড়, দিশেহারা মনন, ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল হয়ে থাকে চর্যাপদ। আমদের প্রথম কবিতা সংকলন। এখনও সংকলনত্বের খাতিরেই যা 'স্বতন্ত্রভাবে অস্তিত্ববান।'

প্রত্যেকটি পাঠ নিজেই নিজের রচনার গল্প বলে। আরেকটু স্পষ্ট করে বলতে চাইলে নিজেই নিজের ইতিহাসও ব্যক্ত করে। চর্যাপদ আমাদের কোন ইতিহাসের মুখোমুখি দাঁড় করায়? ইতিহাস যদি হয় ইতিহাস লেখার ইতিহাস, তবে চর্যাপদও কি বিকল্প ইতিহাসের অবতারণা করতে চায়? প্রত্যেকটি পাঠের যেমন নিজস্ব নন্দনতত্ত্ব থাকে, তেমনি থাকে রাজনীতিও। প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রকটভাবে প্রত্যেকটি পাঠই বহন করে চলে সাংস্কৃতিক রাজনীতির জটিল সমীকরণকে। ধারণ করে থাকে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতাপের অভিব্যক্তিকে। চর্যাপদও নিশ্চয়ই তার ব্যতিক্রম নয়!

চর্যাপদ করা লিখছেন? কাদের কথাই বা লিখছেন? চর্যাকারেরা অধিকাংশই বর্ণাশ্রমের বাইরে অন্ত্যজ-ম্লেচ্ছ পর্যায়ের 'মানুষ কিংবা বর্ণাশ্রমের মধ্যে থাকা নীচ সামাজিক বর্ণের প্রতিনিধি। সিদ্ধাচার্যদের অনেকেই রাজা, রাজপুত্র ও ব্রাহ্মণ ছিলেন বলে তিব্বতী সূত্রে যে মত মেলে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন আহমেদ শরীফ। আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে বলেছেন—"এঁদের নামগুলোই প্রমাণ করে যে, এঁরা অনার্য ও নিম্নবিত্তের বৌদ্ধ সমাজের লোক।"[৭] চর্যাকারেরা যাদের জীবনের ছবি আঁকছেন, তারা ডোম, তাঁতি, ধুনুরী, সুতার, জেলে, কাঠুরে—অর্থাৎ সামাজিক দিক দিয়ে বরাবর অবহেলিত, উপেক্ষিত 'অস্পৃশ্য-অন্ত্যজ' শ্রেণির মানুষ। সমাজকে যারা শুধু দিয়েই এসেছে, বিনিময়ে পায়নি কিছুই। তাদের জীবনকেই বেছে নেওয়া হলো নির্দিষ্ট তত্ত্ব প্রকাশের জন্য, এই নির্বাচনেই স্পষ্ট শিল্পীমানসের মনোগত অভিপ্রায়। কোনো কিছুই যদি আকস্মিক না হয়, তবে বৌদ্ধদের শূন্যতার তত্ত্বে পৌঁছানোর মূলেও রয়েছে দীর্ঘদিনের ইতিহাস। বলাই বহুল্য সে ইতিহাস বঞ্চনার।

"মন হল গাছ, আর পাঁচটি ইন্দ্রিয় তার শাখা।
প্রচুর পাতায়, ফলে আশার কুহক রঙ মাখা।"[৮]

চর্যাপদে বারবার ইন্দ্রিয়ের কথা আসে, আসে মনের কথাও। ইন্দ্রিয়, মনকে শাসন করার যে কথা চর্যাপদে ফিরে ফিরে আসে, তাকে নিছক সাধনতত্ত্ব হিসেবে দেখাটা ভুলও হতে পারে। ইন্দ্রিয় ভোগে উৎসাহ দেয়। ফলে সাধ জাগে। কিন্তু এক বর্ণ ও এক ধর্ম শাসিত সমাজব্যবস্থায় তা পূর্ণ হবার জো নেই। যে ব্রাহ্মণ্য সমাজ এই নিপীড়িত মানুষদের মানুষের মতো বাঁচার অধিকার দিচ্ছে না, তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করটাই কাম্য। কিন্তু তা করার সাধ্য নেই কেননা রাষ্ট্রশক্তিই নিপীড়নকারীর পক্ষে। অস্তিত্বের এই চরম সংকটে নিজের মনকে শাসন করা ছাড়া আর কীই বা থাকতে পারে এই হতভাগ্য মানুষদের কছে। যে পৃথিবী তাদের স্বীকার করেনি, সে পৃথিবীকেই অস্বীকার করতে চেয়েছে তারা। কার্য বা কারণ নিয়ে মিথ্যে বিসংবাদ না করে, শূন্যতাকে প্রেমিক বানানোর মূলে তো কাজ করেছে প্রত্যাখ্যানের অভীপ্সা। আমি যদি না-ই চাই, তবে না পওয়ার দুঃখই যে আসে না। বরং চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে, যে জগতে আমাদের বাস, তা অসম্পূর্ণ। এর বিপ্রতীপে নির্বাণের যে জগৎ, তা সম্পূর্ণ। সেখানে বয়ে চলেছে আনন্দধারা। যে দেহ সকল দুঃখের মূল, সে দেহতেই আছে আনন্দ। সেখানেই সহজ সুখ। যা পেতে হলে বাহ্য অনুষ্ঠানের দরকার পড়ে না। নিস্ফল অগ্নিহোমের ধোঁয়ায় চোখই পীড়িত হয়, আদতে কোন লাভ হয় না। শাসকদের উদ্দেশ্যে শাসিতদের বার্তা এটুকুই—'পথভ্রান্ত তোমরা, পথের সন্ধান পেলে না।' বিষয়ের দিক থেকে প্রত্যাখ্যান যেমন স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট ভাবনার রূপায়ণের ক্ষেত্রেও।

কবিতা ভাব দিয়ে লেখা যায় না। লিখতে হয় শব্দ দিয়েই। চর্যাপদও লেখা হলো। চর্যাপদের আবিষ্কারক চর্যার কাব্যভাষার নাম দিলেন সন্ধ্যাভাষা—"সন্ধ্যাভাষার মানে আলো-আঁধারি ভাষা, কতক আলো, কতক অন্ধকার, খানিক বুঝা যায়, খানিক বুঝা যায় না।"[৯] কেউ বললেন—"হাজার বছর আগেকার এই কাব্যসঙ্কলনের ভাষা যে বাংলা, আজকের বাঙালিকে অন্যের চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করতে হয়। ভাষাই সাহিত্যের দেহ—তার অস্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা সাহিত্য-সৌন্দর্যে পৌঁছবর পক্ষে প্রধান বাধা।"[১০] আমরা একবারও জানতে চাইলাম না এই 'আভিপ্রায়িক ভাষা' প্রয়োগের কারণ কী? ভাষা যদি আদ্যন্ত সামাজিক বিষয় হয়, তবে ভাষাও আধিপত্য থেকে মুক্ত নয়। শাসক তার স্বার্থের খাতিরে শব্দের অর্থকে সীমিত করে। ফলতঃ বিকল্প ভাষা চাই, কিংবা চাই ভাষাগত সংকেতের বহুমাত্রিক ব্যবহার। ভাষা মানেই সংস্কৃত—ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের, আধিপত্যের থেকে বেরিয়ে এসে চর্যাকারেরা শিল্প সৃজনে লৌকিক ভাষাকে বেছে নিলেন। লৌকিক ঐতিহ্যের উপাদানে সমৃদ্ধ হয়ে প্রহেলিকা, হেয়ালি, বাঁধায়, তত্ত্বসংকেতে, রূপকে চ্যালেঞ্জ জানালেন আধিপত্যকামী মূলধারাকেই। সংকট যতো তীব্র, রক্ষণও ততটাই মজবুত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বারবার পদের শেষে 'বুঝবে না মূঢ়' কিংবা গীত ক'জনে বা বোঝে জাতীয় কথা বলার মধ্যে কোন বার্তাই কি নেই? সন্ধ্যাভাষা প্রয়োগের মধ্য দিয়ে চর্যাকারেরা কি এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে 'The medium is the message'?

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যরা যে সময় লিখছিলেন, তাদের সামনে ছিল ছন্দের দুটি ধারা—অভিজাত

সংস্কৃত ছন্দ, অন্যটি লৌকিক অপভ্রংশ ছন্দ। রচনার বিষয় অনুযায়ী সংস্কৃত রীতি হলো উপেক্ষিত। লৌকিক আদর্শ স্বরূপ অপভ্রংশ ছন্দই ব্যবহার করা হলো। লক্ষ্য করবার মতো বিষয় এই যে—... সংস্কৃতের মত অপভ্রংশেও মাত্রা-সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ও লঘু-গুরু-ক্রমবিন্যাসের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম ছিল এবং এইসব নিয়মও বাংলার বিশেষ ধরনের শ্বাসাঘাতবিশিষ্ট উচ্চারণের পক্ষে সর্বাংশে অনুকূল ছিল না। তাই অপভ্রংশের বহুবিচিত্র ছন্দোরীতির মধ্যে যেগুলিতে লঘু-গুরুক্রম সম্পর্কে কিছুটা শৈথিল্যের অবকাশ ছিল সেইগুলিই চর্যাগানের ছান্দসিক আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছে।"[১১] পাদাকুলক ছন্দের মধ্যে এই ধরনের স্থিতিস্থাপকতা থাকায় সেই হয়ে উঠলো সর্বপ্রধান। চর্যাপদের ছন্দে শিথিলতা রয়েছে, তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করাই ভালো। কিন্তু সেই সাথে এটাও জানিয়ে দেওয়া উচিত অপভ্রংশের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে বাংলার নিজস্ব পয়ার-ত্রিপদী ছন্দোভঙ্গীর অমোঘ আগমনী কিন্তু শুনিয়েছিল চর্যাপদই!

কাব্যসৌন্দর্য আলোচনায় অলঙ্কারের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু এটা তো ঠিক যে, কোন পাঠ অলঙ্কার থাকার কারণেই কবিতা হয়ে ওঠে না। আমরা দৈনন্দিন জীবনে অবলীলায় অনেক সময়ই অসচেতনভাবে অলঙ্কার ব্যবহার করি, সে সব কি কাব্য হয়? হয় না। অলঙ্কারের নিছক কেবল উপস্থিতি নয়, সার্থক উপস্থিতিই কাম্য। যেমন কাম্য, বিষয় অনুযায়ী অলঙ্কারের প্রয়োগনৈপুণ্য। যে মন ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের বিরোধী, সে মন মনের কথা বলতে চেয়ে ব্রাহ্মণ্য কাব্যসংস্কারের অঙ্গীভূত অলঙ্কারগুলের মুখাপেক্ষী যে হবে না, তা জোর দিয়েই বলা যায়। কবিতা কীভাবে নিজেই নিজের বিষয় হয়ে ওঠে চর্যাপদ পড়তে পড়তে তা ভীষণভাবে অনুভূত হয়। চর্যাকারেরা ধ্বনিসৌন্দর্য সৃষ্টি করতে চাননি বলে চর্যাপদে খুব কমই শব্দালঙ্কারের দেখা মেলে। নানাধরনের অলঙ্কার থেকে শ্লেষ, উৎপ্রেক্ষা ও রূপক—এই যে তিনটি অলঙ্কারকে তাঁরা নির্বাচন করলেন, প্রত্যেক অলঙ্কারের মধ্য দিয়েই মূল বক্তব্যকে প্রকাশ করেও আড়ালে রাখা যায়। শুধু তাই নয়, তত্ত্বকথা যেখানে সহজভাবে প্রকাশিত, সেখানে পদ নিরলঙ্কার, কিন্তু যেখানে তত্ত্বকথা গূঢ় ও গোপনীয়, সেখানে অলঙ্কার পেয়েছে প্রাধান্য। কী বলবো আর কেমন করে বলবো—চর্যাপদ ছাড়া এর সার্থক পাঠ আর কেউ দিতে পরে কি? রূপ এবং অন্তর্বস্তু বস্তুত যে একই—এই ধারণাও কি চর্যাপদ উসকে দেয় না?

উঞ্চা উঞ্চা পাবত তঁহি বসই সবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।
নিঅ ঘরিণী নামে সহজ সুন্দরী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে গঅনত লাগেলি ডালী।
একেলী সবরী এ বন হিণ্ডই কর্ণ কুণ্ডলবজ্রধারী॥"

(শবরপাদ)

"উঁচু উঁচু সব পর্বত। থাকে সেখানে শবরীবালা
সাজে ময়ূরের পঙ্খে ; গলায় পরে গুঞ্জার মালা।
মত্ত শবর, করিস নে গোল রে পাগল, পায়ে ধরি

নিজের ঘরণী, লোকে নামে চেনে সে সহজ সুন্দরী।
কত কত গাছ আকাশের গায় মুকুলিত সব শাখা
শবরীর কানে বজ্রের দুল হেঁটে যায় একা একা।

(রূপান্তর : সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

শবরপাদের শব্দ আঁচড়ে ফুটে উঠেছে নিটোল এক ছবি। উঁচু উঁচু পাহাড়, তার চূড়ায় বাস করে এক শবর বালিকা। পরণে তার ময়ূরপুচ্ছ। গলায় গুঞ্জা ফুলের মালা। অপরূপ রূপের শবরীকে দেখে শবর, পাগল প্রায়, শবরী বলছে 'দোহাই ব্যস্ত করো না আর' কেননা সে তো শবরেরই ঘরণী। নিজের পত্নীকে পরকীয়া বলে ভ্রান্তি এবং তা ভেঙে দিয়ে পতিকে লজ্জিত করার মধ্যে রইলো অপূর্ব নাটকীয়তা। এইবার সে অসাধারণ ছবিটি—'আকাশের গায় মুকুলিত সব শাখা।' কানে বজ্রের দুল। শবরী একা একা বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শবর শয্যা প্রস্তুত করলো। সারারাত প্রেমে অতিবাহিত হলো। হৃদয়ের পান কর্পূর দিয়ে খেতে শবরের খুব ভালো লাগে। ময়ূরপুচ্ছের সজ্জায় বর্ণাঢ্য যদি হয় রূপবিলাস, ফুলে ঢাকা গাছ নীলচে আকাশ তবে মুখশয্যার সামিয়ানা। ৫০ নং চর্যায় একই কবিকে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না আমাদের। বিশ্বপ্রকৃতির কোলে শবর-শবরীর মিলনকুঞ্জ। জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চারদিক। চারপাশে শুভ্র কার্পাস ফুল। পাকা কঙ্গুচিনা ধানের গন্ধে বাতাস হয়েছে উতলা আকুল। শবর-শবরী মেতে উঠেছে ভালোবাসায়। প্রকৃতি আশ্রয় দিয়েছে প্রেমকে। দেহ থেকে দেহাতীত ব্যঞ্জনা পেয়েছে প্রেম প্রকৃতির সান্নিধ্যেই। ২৮ ও ৫০ নং পদ মিলে পাঠক লাভ করে এক সম্পূর্ণতার বোধ। মনে হয় জ্যোৎস্না ও ভালোবাসা আসলে একই। দুই-ই আলো।

প্রকৃতি ও মানুষের বিভিন্ন ছবি, যা গ্রথিত হয়ে চর্যাপদকে চিত্ররূপময় করে তুলেছে, তা কি শুধু ছবি আঁকার খাতিরেই নাকি কবির মনোগত অভিপ্রায় ছবি লেখার ক্ষেত্রেও স্পষ্ট? ছবির উৎস কবি স্বভাবে। ছবি হতেই পারে কল্পনার রঙে রাঙানো তবে সে কল্পনায় থেকে যায় বাস্তবেরই কোনো অনুষঙ্গ। আসলে কবি যা বলতে চান, কিংবা কবি হয়তো কিছুই বলতে চান না ; সমস্তটাই পাঠকের ওপর ছেড়ে দেন। সমস্ত ক্ষেত্রেই কেন্দ্রীয় ভাবের সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই শিল্পের নির্মিতি। এ নির্মিতিতে ছবির যোগ কবিতার আত্মার সঙ্গে। যাকে ভেবেচিন্তে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, যা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ, সুন্দর। যে দুটি পদের উল্লেখ করেছি, তাতে ও একথা খুব স্পষ্ট। শবরীর রূপ, শবরের আকুল প্রাণ, জ্যোৎস্নারতে মধুরমিলন, এরপর শবরের শবরত্ব ঘোচার মধ্যেই তো রয়ে গেল সহজসাধনার মূল কথাগুলি, চর্যাপদে একই ছবি অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গে পৃথক পৃথক অর্থের দ্যোতনা রাখে, আশ্চর্য হতে হয় এখানেই এই দুটো স্তরকে কী দক্ষতায় মিলিয়ে দেন সিদ্ধাচার্যরা।

'চর্যাগীতিকোষ-এ আছে অতি সাধারণ মানুষের শব্দময় জীবনের ছবি। গাছ ফাড়ার শব্দ, পাটা জোড়ার শব্দ, মাহুতের হাতি চালাবার শব্দ, হরিণ-শিকারির হাঁক, বরযাত্রার কাড়া নাকাড়ার শব্দ, গানের শব্দ, পটহ মাদল ডমরু বীণা বাঁশি বাজানোর শব্দ, পুঁথি পড়ার শব্দ, পুজো করার শব্দ—সব মিলিয়ে চর্যাগানের আসর সরগরম। এরই ভেতর মঠ মন্দির চূড়াময় শূন্যতায় অনাহত শব্দের উত্থান।"[১২] প্রথম চর্যাপদে বলা হয়েছে—'চঞ্চল চিএ পইঠো কাল' অর্থাৎ চঞ্চল চিত্তে কাল বা ধ্বংসের বীজ প্রবেশ করেছে। ১৬ নং চর্যায় পাই—'অণহ কসন

ঘন গাজই'। মুনিদত্ত টীকাতে লিখছেন—'অনাহতমিতি শূন্যতাশব্দং কসনং ভয়ানকং।' সব শব্দই শূন্যে গিয়ে মেশে, কিন্তু শূন্যতার ও যে শব্দ হতে পারে, চর্যাপদই তো প্রথম তার কথা বললো। চর্যার কবিরা রঙ নিয়েও যে ভাবিত ছিলেন, সোনা, রূপা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার প্রভৃতি শব্দ থেকে পরোক্ষভাবে তা অনুমান করাই যায়। ২১নং চর্যায় বলা হয়েছে—'কালা মুষা উহ ণ বাণ।' অর্থাৎ কালো মুষিকের রঙ বোঝা যায় না। রঙে ও রূপে যে অচ্ছেদ্য সম্পর্ক, চর্যার পদকর্তারা তা সম্যকভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। প্রকাশই যদি কবিত্ব হয়, চর্যাপদ তবে কবিতা।

"যে কবিতায় দুরূহ পারিভাষিক শব্দের প্রয়োগ যত বেশি, অর্থ যত দুর্বোধ্য, অন্বয়বিধান যত দুঃসাধ্য সে-কবিতা অনুবাদের বিশেষ করে কবিতায় অনুবাদের, সুযোগ তত বেশি ; এ কথা চর্যাগানের রূপান্তর ঘটাতে গিয়ে সর্বাগ্রে অনুভূত হয়। এবং যে কবিতা যত কম সংখ্যকের উপভোগ্যতার জন্য রচিত সে কবিতায় পরীক্ষানিরীক্ষার সম্ভাবনা ততই জোরালো, চর্যাগান সেদিক থেকেও শক্তিমান"[১৩] চর্যাপদ আবিষ্কৃত হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন কবি-প্রাবন্ধিকেরা চর্যাপদের অনুবাদে প্রয়াসী হয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শঙ্খ ঘোষ, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অমিতাভ দাশগুপ্ত, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীতশোক ভট্টাচার্য, সুমন গুণ কিংবা সুকুমার সেন, নীলরতন সেন, গোপাল হালদার, অতীন্দ্র মজুমদার, পবিত্র সরকার প্রমুখ ব্যক্তিরা নিজের মতো করে চর্যাপদের অনুবাদ করেছেন। আমরা জানি সমস্ত সার্থক অনুবাদই একধরনের আবিষ্কার। সাহিত্যমাত্রই যেমন অনন্ত সম্ভাবনার ক্ষেত্র তৈরি করে, অনুবাদও তাই। একই চর্যাপদ বিভিন্ন ব্যক্তির চেতনার রঙে তাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে—

ঢেণ্ঢনপাদ : ৩৩

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী॥
বেঙ্গসঁ সাপ বড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে ষামাঅ॥
বলদ বিআএল গবিআ বাঝেঁ
পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী সৌ নিবুধী।
জো যো চৌর সৌ দুষাধী॥
নিতে নিতে ষিআলা ষিহে যম জুঝঅ।
টেণ্টণ পাএর গীত বিরলে বুঝঅ॥

রূপান্তর : শঙ্খ ঘোষ

টিলায় আমার ঘর-পড়োশিবিহীন—
হাঁড়ি আছে ভাত নেই, ভিড় দিন দিন।
কী-ব্যাঙের সংসার বেড়ে বেড়ে যায়
দোয়া দুধ ফিরে যায় বাঁটের মায়ায়!

বলদই বিয়োয় আর গরু হলো বাঁজা,
ত্রিসন্ধ্যা পালনের দুধ দোয়া সাজা।
যার আছে বোধ সেই বড়ো নির্বোধ
যে-ই চোর সে-ই সাধু—সব শোধবোধ।
শেয়ালেই যোঝে রোজ সিংহসমান—
খুব ভেবে বোঝা যায় ঢেণ্ঢণগান।

রূপান্তর : পবিত্র সরকার

ঊর্ধ্বে এ টিলায় ঘর বেঁধে আছি প্রতিবেশীহীন,
শূন্যভাণ্ড ; তবু দ্যাখো অতিথি সংক্রম নিত্যদিন।
সংসারসরিৎ বহে কী উত্তাল প্রচণ্ড ত্বরায়—
গাভীস্তনপরিত্যক্ত দুধ ফের উৎসে ফিরে যায়?
বলদ প্রসূতি হয়, গাভী থাকে বন্ধ্যা অগভিণী।
তারই দুধে পূর্ণ পাত্র! অবিশ্বাস্য এ কোন্ কাহিনি!
যে ব্যক্তি চতুরশ্রেষ্ঠ, জেনো সে-ই নিপাট নির্বোধ ;
চোর সে স্বয়ং সাধু—নিজেকেই তার প্রতিরোধ।
দুর্বল শৃগাল যুদ্ধে প্রত্যহ সিংহের মুখোমুখি!

ঢেণ্ঢণপাদের গীতপ্রহেলিকা জাগায় কৌতুকী।

অনুবাদ থেকে স্পষ্ট দুই অনুবাদকের মন। সার্থক অনুবাদকই পারেন মূল পাঠের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। অনুবাদের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি, সময় কীভাবে নিজেকে চিনিয়ে দেয়, তা অন্য প্রসঙ্গ। এখানে কেবল এটুকুই বলার অনুবাদক শুধু গ্রহণ করেন না। ফিরিয়েও দেন সাধ্যমতো। স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ অনুবাদ হলে অনুদিত পাঠের থেকে প্রতিফলিত আলোয় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে উৎস পাঠ-ই। পাঠের অবচেতন বলে যদি কিছু থাকে, অনুবাদ ছাড়া তাকে কে-ই বা মূর্ত করতে পারে?

বলা হয় একটি পাঠের মধ্যে লুকিয়ে থাকে আরো অনেক পাঠ। একটি কবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকতে পারে একাধিক উপন্যাস কিংবা ছোটগল্পের বীজ। যেমন চর্যাপদের মধ্যে লুকিয়ে ছিল হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে', সেলিনা হোসেনের 'নীল ময়ূরের যৌবন' কিংবা শিবাশিস, মুখোপাধ্যায়ের 'কাহ্ন' উপন্যাসের সম্ভাবনা। দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চর্যাপদের হরিণী' লেখাটিও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। আমরা জানি প্রত্যেক সার্থক শিল্পই পারে অন্য কোনো শিল্পীকে শিল্পসৃজনে উদ্দীপ্ত করতে। চর্যাপদও creative energy হিসেবে কাজ করে চলেছে। পাঠক বিশেষে বদলে যাওয়া পাঠের মধ্যেই থাকে অনুসৃজনের সম্ভাবনা, আর এভাবেই মননে, চিন্তনে, অনুবাদে, অনুসৃজনে স্মৃতিসত্তা ভবিষ্যৎ জুড়ে রয়েছে চর্যাপদের সর্বময় উপস্থিতি।

বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক অসচ্ছলতা ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতাবোধের যুগে দাঁড়িয়ে কীভাবে পড়বো চর্যাপদকে? আমরা তো জানি কোনো পাঠেরই স্থায়ী বা নির্দিষ্ট অর্থ বলে কিছু হয় না। একই পাঠ পাঠকভেদে যেমন বদলে যায়, তেমনি একই পাঠকের কাছে সেই একই পাঠ পাঠভেদে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ নিয়ে হাজির হতে পারে। সুতরাং চর্যাপদের সাহিত্যমূল্যের

বিষয়টি আপেক্ষিক। ব্যক্তিভেদে, পাঠভেদে তা পাল্টে যেতে বাধ্য। শুধু এটুকুই বলার চর্যাপদ যেমন প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বয়ান, আমাদের আলোচনাও হোক যেকোন আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিকল্প প্রতিসন্দর্ভ। একদিকে ব্যক্তিমানুষ আর একদিকে সময়—এই দুয়ের ভেতর সঙ্গতি স্থাপন করে চলে প্রতিটি সৎ সাহিত্য। আর সে সূত্রেই সময়বিশেষে সাহিত্য হয়ে ওঠে আমাদের অস্তিত্বের দর্পণ। চর্যাপদ পড়তে পড়তে খুব স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় নগরের বাইরে থাকা বস্তিবাসী সেই মানুষদের, যারা কোন কালেই কেন্দ্রের কাছাকাছি আসতে পারে না। হাঁড়িতে ভাত নেই যাদের আতুড় ঘর নিয়ে এখনো যারা ভাবে ...। কোনো জীবনমুখী গানই যাদের সান্ত্বনা দেয় না। এ জগৎকে প্রত্যাখ্যান করতে চায় তারা নিজের মতো করে। বাসনার নাগপাশ ছিন্ন করতে চেয়েও পারে না। যন্ত্রণাবিদ্ধ হয়। তাদের যন্ত্রণার থেকে নিংড়ে আনা ফুলই ⌐ চর্যাপদ। প্রতিবাদের ভাষা, প্রতিরোধের আগুন বুকে নিয়ে হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে আসা সে চর্যাপদ। সমকালের সবকালের চর্যাপদ। আমাদের প্রথম কবিতাবই।

সূত্র পঞ্জী

১. চর্যাপদ : আচ্ছন্ন নৈর্ঋত, সুমন গুণ (সম্পাদিত), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৬, প্রথম প্রতিভাস সংস্করণ এপ্রিল ২০০৬, পৃষ্ঠা ৩১

২. তদেব, পৃষ্ঠা-৪৭

৩. গঠনবাদ, উত্তর—গঠনবাদ এবং প্রাচ্য কাব্যতত্ত্ব, গোপীচন্দ নারঙ, সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় (অনুবাদ) সাহিত্য অকাডেমি, প্রথম সংস্করণ ২০০৯, পৃষ্ঠা-৪৩

৪. বাংলা ফিল্মের গান ও সত্যজিৎ রায়, সুধীর চক্রবর্তী, গাঙচিল, দ্বিতীয় মুদ্রণ জুন ২০১০, পৃ.১৪

৫. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমেদ শরীফ, নিউ এজ পাবলিকেশন, পুনর্মুদ্রণ-২০০৭, পৃ.১৬৯

৬. পদচিহ্ন চর্যাগীতি, বীতশোক ভট্টাচার্য, বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি ২০১১, পৃ.১০৩

৭. বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য, আহমেদ শরীফ, পূর্বোক্ত, পৃ.১৭৩

৮. চর্যাপদ : আচ্ছন্ন নৈর্ঋত, সুমন গুণ (সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ.৫৬

৯. হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (সম্পাদিত) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, তৃতীয় সংস্করণ শ্রাবণ ১৪১৩, পৃষ্ঠা-৮

১০. প্রাচীন কাব্য : সৌন্দর্য জিজ্ঞাসা ও নবমূল্যায়ন, ক্ষেত্রগুপ্ত, পুস্তক বিপণি, পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ বৈশাখ ১৪০৮, পৃ. ১৪।

১১. চর্যাগীতি পরিক্রমা, ড. নির্মল দাশ, দে'জ পাবলিশিং, ষষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই ২০০৯, পৃষ্ঠা-৮৩

১২. পদচিহ্ন চর্যাগীতি, বীতশোক ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮

১৩. তদেব, পৃ. ৫৯

দ্রষ্টব্য : মূল চর্যাপদ এবং চর্যার রূপান্তর উদ্ধৃত করেছি যথাক্রমে ড. নির্মল দাশ-এর চর্যাগীতি পরিক্রমা, সুমন গুণ সম্পাদিত চর্যাপদ : আচ্ছন্ন নৈর্ঋত বই থেকে।